মি. ডিগবাজি আহমদ

আহসান কবির

২০০৫ সালে এসে হুমায়ূন আহমেদ যদি তার বিখ্যাত নাটক 'কোথাও কেউ নেই' লিখতেন বা তৈরি করতেন, তাহলে কাহিনী কিংবা নাটকের নাম দুটোই হয়তো বদলে যেত। নাটকের নাম হতে পারতো কোথাও মওদুদ আছে! আর কাহিনীতে বাকেররূপী ঝিন্টুর ফাঁসি হলেও সেটা কার্যকর হতো না। রাষ্ট্রপতি তার বিশেষ ক্ষমতাবলে 'ঝিন্টু বাকের'কে ক্ষমা করে দিতেন। বিখ্যাত হিন্দি ছবি 'ম্যায় হু না'র মতো ঝিন্টু সাহেব বলতে পারতেন, প্রধানমন্ত্রী হু না? প্রধানমন্ত্রী ছাড়া রাষ্ট্রপতি কিংবা মওদুদ সাহেব আর কতোটা পারেন?

ঝিন্টু সাহেবের মা, তার ভাই কিংবা আত্মীয়স্বজন প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি কিংবা মওদুদ আহমদের জন্য এখন যতোই প্রার্থনা করুন, দুর্ভাগ্য এই ঝিন্টু সাহেব এ দেশবাসীর কাছে 'বাকের' হতে পারলেন না। গালকাটা কামালের আত্মীয়স্বজন এখন নিশ্চয়ই অনুশোচনায় ভুগছেন! ইস তাদেরও যদি সে সময় একজন মওদুদ থাকতেন! গালকাটা কামাল তাহলে দেশ বা বিদেশের কোথাও বিএনপি বা তার কোনো অঙ্গসংগঠনের নেতা হয়ে ভালোই থাকতে পারতেন!

ঝিন্টু আমার নাম

মহিউদ্দিন ঝিন্টু। কথায় আছে, 'বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়।' কুখ্যাত গালকাটা কামালের খালাতো ভাই এই ঝিন্টু। স্বাধীনতার পরপরই তিনি এসএসসি পাস করেন। পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়ার ডিস্টিলারি রোডে বসবাসরত তার এক বন্ধু জানিয়েছেন স্বাধীনতার পর গণটোকাটুকি বা মহা নকল বর্ষে ঝিন্টু এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন গেন্ডারিয়া স্কুল থেকে। অবশ্য তার আরেক বন্ধু বলেছেন, পোগোজ স্কুল থেকে ১৯৭৪ সালে ঝিন্টু এসএসসি পাস করে সোহরাওয়ার্দী কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৭৬ সালে এইচএসসি পাসের পর জগন্নাথ কলেজের নৈশ শাখায় ভর্তি হন। বিষয় ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। জগন্নাথ কলেজে পড়তে এসে জড়িয়ে পড়েন ছাত্রলীগের (জাসদ) রাজনীতির সঙ্গে। সাইফুর রহমানের (অর্থমন্ত্রী নন। ঢাকার সাইফুর, যিনি জাসদ থেকে জাতীয়তাবাদী যুবদলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। পরে এরশাদের ছায়াতলে আশ্রয় নেন) রিক্রুট ছিলেন এই ঝিন্টু। ছাত্রলীগ করার সময় তিনি পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হবার পর নিগৃহীত হয়েছিলেন। এই নিগ্রহের পুঁজি নিয়ে তিনি দেখা করেছিলেন মশিউর রহমান যাদু মিঞার সঙ্গে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যাদু মিঞা জিয়াউর রহমানের সিনিয়র মন্ত্রী ছিলেন। সে সময় বিচারপতি সাত্তার সাহেবের নেতৃত্বে জাগদলের প্রথম সভায় ঝিন্টু উপস্থিত ছিলেন। এরপর যুবদল গঠিত হলে সাইফুর রহমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে চলে আসেন। ১৯৭৯ সালে ঝিন্টু ঢাকা মহানগর শাখা যুবদলের প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি হয়ে যান।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ

পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়া ও ডিস্টিলারি রোডের অনেকেই ঝিন্টু সম্পর্কে বলেছেন, ক্ষমতাসীন দলকে পুঁজি করে মাস্তানি, টেন্ডারবাজির প্রক্রিয়া স্বাধীনতার পর থেকে শুরু হলেও পর পর দুই সামরিক শাসনামলে দুর্বৃত্ত, শীর্ষ সন্ত্রাসীরা ঢুকে পড়ে এর ভেতর এবং এই দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া শিল্পে পরিণত হয়। গালকাটা কামাল, ইমদু, শাহেন শাহ বা বড় সাগীর ও ঝিন্টুরা ছিলেন '৭৫-পরবর্তী এমনতর সন্ত্রাসী, যাদের নাম শুনলেই মানুষ ভয় পেত। এরা মিলেই পুরনো ঢাকায় গেন্ডারিয়া যুব সংসদ গড়ে তুলেছিলেন।

ভজহরি রোডের সত্যেন নাথ নামের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ১৯৭৯ সালে আটকে রেখে ঝিন্টুর ক্যাডাররা ৫ লাখ টাকা আদায় করেছিল। ১৯৮০ সালের জুন মাসে ঝিন্টুর বিরুদ্ধে তাঁতীবাজার এলাকার তিনটি স্বর্ণের দোকান লুটের অভিযোগ ওঠে। ১৯৮২ সালের জানুয়ারিতে তিনি জড়িয়ে পড়েন ডাবল মার্ডারের ঘটনায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ১৯৮২ সালের ২৩ জানুয়ারি আবদুল খালেক রানা ও ফিরোজ আল মাসুদ নামের দু'ব্যক্তিকে তাদের ডেমরা ও যাত্রাবাড়ীর বাড়ি থেকে ডেকে এনে প্রথমে অপহরণ ও পরে গলা কেটে হত্যা করা হয় (গলা কেটে হত্যা, অতঃপর লাশ টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়া পুরনো ঢাকায় আশ্রয় নেয়া কিছু সন্ত্রাসীর 'ট্র্যাডিশন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে গেন্ডারিয়ার রাইফেলস ক্লাবে সায়েম ও মহসিনের জোড়া খুন এবং টুকরো করার ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনা ঘটিয়েছিল আওয়ামী নেত্রীর দুই ছেলে। জোট সরকারের আমলে আরেক ছাত্রদল কাম যুবদল নেতা কাজল ও ডাকাত শহীদরা ব্যবসায়ী পিতা-পুত্রকে শত টুকরো করে হত্যা করেছিল)। ২৫ জানুয়ারি মেডিকেল কলেজ মর্গে রানা ও মাসুদের লাশ শনাক্ত করেন তাদের স্ত্রীরা। এরপর হতভাগ্য এই দুই স্ত্রী ডেমরা থানায় আবুল কাসেম মানিক, শহীদ হোসেন ও গালকাটা কামালকে অভিযুক্ত করে মামলা করেন। ১৯৮২-র ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারি করে এরশাদ সাহেব ক্ষমতা দখল করলে মামলাটি সামরিক ট্রাইব্যুনালে চলে যায়। পুলিশ মানিক, শহীদ, গালকাটা কামাল ছাড়াও মহিউদ্দিন ঝিন্টু ও রুহুল আমিন হাওলাদার (বর্তমানে জাতীয় পার্টির মহাসচিব) নামে চার্জশিট দেয়। হত্যাকান্ডে রুহুল আমিন হাওলাদার সাহেবের জিপ গাড়িটি ব্যবহৃত হয়েছিল! পরে সামরিক ট্রাইব্যুনালে আবুল কাসেম মানিক, শহীদ হোসেন, গালকাটা কামাল ও মহিউদ্দিন ঝিন্টুর ফাঁসির আদেশ হয়। খালাস পেতে সমর্থ হন রুহুল আমিন হাওলাদার। তিনি মহান এরশাদের ছায়াতলে গিয়ে আশ্রয় নেন।

nvmbv gI``‡K ï‡f”Qv Rvbv‡”Qb mB‡Wb cevmx evOvjiv, cv‡k wS›U

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত চার আসামির মধ্যে একমাত্র গালকাটা কামালের ফাঁসি কার্যকর করা হয় ১৯৮২ সালের অক্টোবর। বাকি তিনজন প্রথম থেকেই পলাতক ছিলেন। এই তিনের মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান তথা সিস্টেমবাজ ছিলেন আবুল কাসেম মানিক। তিনি সবকিছু ম্যানেজ করে ঘটনার পাঁচ বছর পর ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। পরদিনই তিনি মুক্তি পান। কারণ ৬ ডিসেম্বর তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচার এরশাদ! ১৯৮২ থেকে এখনো শহীদ হোসেন পলাতক। ২২ বছর ধরে ঝিন্টুও তাই ছিলেন। কিন্তু এই ২২ বছরে ঘটে যায় অনেক কিছু।

ঝিন্টু কোনো উপায়ান্তর না দেখে ১৯৮২ সালেই পালিয়ে যান ইন্ডিয়া। (পালানোর জন্য দেশটা সম্ভবত খুব বেশি কার্যকর। ভারত সরকার অনেক দিন ধরে অবশ্য বলে আসছে, তাদের দেশের ঝিন্টুরাও বাংলাদেশে এসে পালিয়ে থাকে!) সেখানে সুলতান আহমদের নামে এক কংগ্রেস নেতাকে ম্যানেজ করতে সক্ষম হন ঝিন্টু। ম্যানেজ করে ফেলেন ভারতীয় পাসপোর্ট। সেটা নিয়ে প্লেজার ট্রিপে বের হন থাইল্যান্ড। ১৯৮৪ সালের ঘটনা এটি। থাইল্যান্ডের একটি হোটেলে তিনি আরেকটি ঘটনার জন্ম দেন। রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের ব্যাপারটি দিয়ে 'সিমপ্যাথি নিয়ে' ঝিন্টু জাসদ থেকে জাতীয়তাবাদী যুবদলে ঢোকেন। এবার থাইল্যান্ডের এক হোটেলে জিয়াউর রহমানের হত্যাকারী কথিত মেজর খালেদকে 'ব্যাপক উত্তম-মধ্যম' দিয়ে থাই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন ঝিন্টু। তার হাতে তখন ভারতীয় পাসপোর্ট। এই মেজর খালেদকে মার দেয়ার ঘটনাটা তিনি জানান বিএনপির অনেক বড় বড় নেতাকে। সিমপ্যাথির গ্রাউন্ডটা তখন থেকেই নাকি ঝিন্টুর প্রতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু থাই পুলিশ ইন্ডিয়ান হিসেবে তাকে তিন মাস আটকে রাখলেও বেরিয়ে এসে ভারত হয়ে জাপান চলে যান। ব্যাপারটা ইন্ডিয়ান পুলিশ জেনে ফেললে ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাকে গ্রেপ্তারের অনুরোধ জানানো হয়। ১৯৮৫ সালে জাপানে ইন্টারপোল তাকে তিন দিন আটক রেখে জেরা করে। এর আগে ঝিন্টুর ভাষায়, তিনি তৎকালীন বিএনপি নেতা ও পরবর্তীকালের মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদার, মির্জা আব্বাস ও গয়েশ্বর রায়কে চিঠি লিখে মতামত জানতে চান। সবাই নাকি ঝিন্টুকে সুইডেনে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইন্টারপোলের জেরার সময় তিনি দেশে ঘটা খুনের ঘটনাটার 'অন্যরকম' বিবরণ দিয়ে আরেক দফা 'সিমপ্যাথি' আদায় করতে সক্ষম হন। ভিসা পেয়ে যান তিন দেশের। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও সুইডেনের। পরে ১৯৮৬ সালে সুইডেনে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আশ্রয় পাওয়ার পর থেকে এখনো সুইডেনেই আছেন মহিউদ্দিন ঝিন্টু।

১৯৯২ সালে ঝিন্টু টেলিফোনে বিয়ে করেন এ দেশের মেয়ে আলোকে। জিসান নামে তাদের এক ছেলে রয়েছে। সুইডেনে তিনি হোটেল ব্যবসা করেন। তার হোটেলের নাম পায়েল। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এলে চেষ্টা-তদবির শুরু করেন। ইউরোপের কোনো দেশে বিএনপি নেতারা এলেই ঝিন্টু তাদের সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইতে থাকেন। ১৯৯৩ সালের শেষে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতিন চৌধুরীর দেখা পান। তাকে ম্যানেজও করে ফেলেন। কিন্তু দেশে ফিরে বিগড়ে যান মতিন চৌধুরী। ঝিন্টুর আর ক্ষমা পাওয়া হয়নি।

পুরো আওয়ামী লীগ আমলে শুধু অপেক্ষাতেই ছিলেন ঝিন্টু। ২০০১ সালে বিএনপি ও জোট সরকার ক্ষমতায় এলে তিনি আবারও তোড়জোড় শুরু করেন। সুইডেনে তার পায়েল রেস্টুরেন্টে সংবর্ধনার আয়োজন করেন, যেখানে আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গেও তার দেখা হয়েছিল। তাদের ছবি ছাপা হয়েছিল সুইডেন থেকে

১৯৮২ সালের জানুয়ারিতে তিনি জড়িয়ে পড়েন ডাবল মার্ডারের ঘটনায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ১৯৮২ সালের ২৩ জানুয়ারি আবদুল খালেক রানা ও ফিরোজ আল মাসুদ নামের দু'ব্যক্তিকে তাদের ডেমরা ও যাত্রাবাড়ীর বাড়ি থেকে ডেকে এনে প্রথমে অপহরণ ও পরে গলা কেটে হত্যা করা হয়

প্রকাশিত 'প্রবাসীর কণ্ঠ' পত্রিকায়। জোড়া খুনের ঘটনার ২২ বছর পর ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এরপর বিএনপির একাধিক সিনিয়র মন্ত্রী ও নেতাদের আশ্বাস পেয়ে ৩ জানুয়ারি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। এর আগে অবশ্য সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুর রেজ্জাক খানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনিই ঝিন্টুর দণ্ড মওকুফের আবেদনপত্রের খসড়া করে দেন। অনেকটা নীরবে ১৩ জানুয়ারি ক্ষমা পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। সবাইকে জানাতে ভোলেন না যে, তার ফাঁসির দণ্ড মওকুফ হয়েছে। জানুয়ারি মাসেই এ নিয়ে পত্রিকায় রিপোর্ট বের হলে তিনি সুইডেনে ফিরে যান। সুইডেন বিএনপির নেতা এখন মহিউদ্দিন ঝিন্টু। জেলে গিয়ে সুইডেন আসলামের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কি না জানা যায়নি। সুইডেন আসলাম যা পারেননি, গত ২২ বছর ক্রমাগত চেষ্টার মাধ্যমে সেটাই করতে পেরেছেন সুইডেন ঝিন্টু। তিনি এখন মুক্ত বিহঙ্গ।

ev t_‡K ॥S›U, e¨wi÷vi gI`` I ˆmq` Ave`j KvBqg gKj

... আহমদ

মওদুদ আহমদ। এক রম্যলেখক তার নাম দিয়েছিলেন মৌ ও দুধের লোভে বারবার ছুটে আসা আহমদ। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্রলীগ এবং পরে আওয়ামী লীগ করতেন। ১৯৭১ সালে তিনি মুজিবনগর সরকার গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গেও নাকি জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতার পরে নাকি বঙ্গবন্ধুর গাড়ি চালাতেও পিছপা হননি। কিন্তু ১৯৭৩ সালে এমপি মনোনয়ন না পেয়ে কেমন জানি হয়ে যান। যিনি বঙ্গবন্ধুর গাড়ি চালাতেও কুণ্ঠিত হননি, সেই তিনি ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। পল্লীকবির একান্ত চেষ্টায় মওদুদ সাহেব জেল থেকে মুক্তও হয়েছিলেন। তবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর তিনি আবারও বদলে যান। যোগদান করেন বিএনপিতে। সেই থেকে তার নাম হয়ে যায় ডিগবাজি আহমদ। ১৯৭৮ সালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। মন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৯ সালের পর বিএনপিতে তার ভাষায় 'বিদ্রোহ' করেন এবং মন্ত্রিত্ব হারান। ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন এলে দুর্নীতির দায়ে জনাব মওদুদ গ্রেপ্তার হন এবং তার কয়েক বছর কারাদণ্ড হয়। সম্ভবত তখনই তিনি আরেক দণ্ডপ্রাপ্ত ঝিন্টুর বেদনাটা বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ এর আগে পুরনো ঢাকায় আয়োজিত যুবদলের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মওদুদ সাহেব। আর ঝিন্টু ছিলেন মহানগরী যুবদলের প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি। পরিচয় তখনই হয়েছিল তাদের। আর তাই জেলে বসে মওদুদ সাহেব এরশাদ সাহেবের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করেন। বেরিয়ে এসে আবারও ডিগবাজির মাধ্যমে এরশাদের সড়ক, পরিবহন ও রেলওয়ে মন্ত্রী হন। এরপর বহুদিন তিনি এরশাদের কোল থেকে নামেননি। বিনিময়ে পেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং উপ-রাষ্ট্রপতির পদ। এরশাদের শেষ দিনগুলোতে এরশাদের হয়ে মওদুদ আহমদ কম সাফাই গাননি। '৯১ সালে জাতীয় পার্টি থেকে এমপি নির্বাচিত হয়ে জাপা সংসদীয় দলের নেতা হন। তখন খালেদা জিয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং আন্দোলনও করেছিলেন। '৯৬ সালের ৭ মার্চ এক জনসভায় এই মওদুদ আহমদ বলেছিলেন, 'খালেদা জিয়ার নির্বুদ্ধিতা, অপরিপক্বতা ও দৃষ্টিহীনতা দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে!' হায়, খালেদা জিয়ার এই নির্বুদ্ধিতা, অপরিপক্বতা ও দৃষ্টিহীনতা মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তার পথের পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়। মওদুদ সাহেব আবারও ডিগবাজি দিয়ে বিএনপিতে আসেন এবং ১৯৯৬ সালে খালেদা জিয়ার ছেড়ে দেয়া আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গো-হারা হারেন। অবশ্য এরপর থেকে তিনি বিএনপিতেই আছেন। কারণ দীর্ঘদিন পর ১৯৯৬ সালে বিএনপিতে ফেরার সময় তিনি কাব্য করে বলেছিলেন, 'ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে এসেছি।' বিএনপির ঘরে থেকে মওদুদ সাহেব এখন আইনমন্ত্রী!

মওদুদ সাহেব অবশ্য ভালো লেখকও। তার একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম 'দি এরা অফ শেখ মুজিব'। বইটি সম্পর্কে আলোচনায় না যাওয়াই ভালো। যে বিএনপি তথা জিয়াউর রহমানের দল করছেন, মওদুদ সাহেব তার লেখা বই 'ডেমোক্রেসি অ্যান্ড দ্য চ্যালেঞ্জ অফ ডেভেলপমেন্ট'-এ সেই জিয়াউর রহমানকে উল্লেখ করেছেন ঠাণ্ডা ও নিষ্ঠুর একনায়ক হিসেবে! ভাবা যায়? শুধু জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত না করা কিংবা তাকে ঠিকমতো 'শহীদ রাষ্ট্রপতি' না বলায় যদি বদরুদ্দোজা তার প্রেসিডেন্ট পদ হারাতে পারেন, তাহলে মওদুদ সাহেবের কী শাস্তি হওয়া উচিত ছিল? অথচ তিনি এখনো আইনমন্ত্রী আছেন বহাল তবিয়তে! আবার এরশাদের ঘনিষ্ঠজন থাকাবস্থায় তার লেখা আরেক বইতে মওদুদ সাহেব এরশাদের ঘোর সমালোচনা করেছিলেন, এমনকি তার সঙ্গে শেখ হাসিনার লংড্রাইভেরও বিবরণ দিয়েছিলেন। সেই মওদুদ কিন্তু আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে খালেদা জিয়াবিরোধী আন্দোলনও করেছেন। এতো রূপ, এতো ডিগবাজি বোধ করি শুধু মওদুদ আহমদকেই মানায়। এগুলো না করলেই বরং তিনি হয়তো মওদুদ আহমদ থাকবেন না!

মওদুদ সাহেবের মতো যারা ডিগবাজি দেন, জনগণের সামনে তাদের একটি ভাষ্য থাকে। জনতার স্বার্থে, দেশের স্বার্থেই তারা এসব করে থাকেন। মওদুদ সাহেবের সেই রেকর্ডও নেই। তিনি ও তার কোম্পানি বহুদিন বেনিয়া তেল কোম্পানি নাইকোর আইন উপদেষ্টা ছিল। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মতো আইন মন্ত্রণালয় থেকে যে কাগজপত্র পাঠানো হয়েছিল, তাতে নাইকোর পক্ষে নির্লজ্জ দালালি ছিল। বরং মওদুদ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস নাইকোর পক্ষে যে সুপারিশমালা কিংবা নীতি নিয়েছিল, আইন মন্ত্রণালয় সেই একই ব্যবস্থা নিয়েছিল। অর্থাৎ নাইকোর কাজ পেতে, কাজ শুরু করতে কোনো আইনি জটিলতা যেন না

ঝিন্টুর ভাষায়, তিনি তৎকালীন বিএনপি নেতা ও পরবর্তীকালের মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদার, মির্জা আব্বাস ও গয়েশ্বর রায়কে চিঠি লিখে মতামত জানতে চান। সবাই নাকি ঝিন্টুকে সুইডেনে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন

ঝিন্টুর ফাঁসির রশি মওদুদের গলায়

অনিরুদ্ধ ইসলাম

বহুদিন পর ধরা খেয়েছেন রাজনীতিতে 'রঙিলা' বলে পরিচিত আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। বাংলাদেশ হওয়ার পর আওয়ামী লীগ ছাড়া সব সরকারের উচ্চপদে থেকেছেন তিনি। ওই সব সরকারের সব অন্যায় কাজ ও অবস্থানে আইন ও সাংবিধানিক যথার্থতা প্রমাণ করতে সব সময় আগ বাড়িয়ে কথা বলেছেন। যথারীতি বলেছেন ফাঁসির আসামী ঝিন্টুর ক্ষমা প্রসঙ্গে। কিন্তু এবার আর বেরিয়ে যেতে পারেননি।

মহিউদ্দিন ঝিন্টুর ফাঁসির দন্ডাদেশ মওকুফ করার রাষ্ট্রপতির আদেশ সংবিধান সম্মত বলে আইনমন্ত্রী যে দাবি করেছেন সেটা ঠিকই আছে। সংবিধানের ৪৯ বিধি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যেকোনো আদালত কর্তৃক দেয়া দন্ডাদেশ মওকুফ করার অধিকার রাখেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা নিঃশর্ত নয়। এ ব্যাপারে তাকে প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের সুপারিশ অনুযায়ীই পদক্ষেপ নিতে হয়। এবং রাষ্ট্রপতির অনুকম্পা সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু আইনি প্রক্রিয়া আছে। সেই প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে এ ধরনের কিছু সংবিধান অনুসারেই রাষ্ট্রপতির করা সম্ভব নয়। আর এই আইনি প্রক্রিয়া হচ্ছে দন্ডপ্রাপ্ত আসামির আইনের কাছে আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ ঐ দন্ডাদেশ মেনে নিয়ে কারাবরণ। আর তার পরই অনুকম্পার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়। এবং সে অনুসারে দন্ডপ্রাপ্ত আসামি নিজে অথবা তার পক্ষ হয়ে কেউ রাষ্ট্রপতির কাছে সরাসরি অথবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আবেদন করেন। আবেদন পাওয়ার পর ঐ আসামির জেলজীবনের আচরণ এবং তার নিজ এলাকার থানার মাধ্যমে তার জীবনাচরণ সম্পর্কে রিপোর্ট চাওয়া হয়। আর তার পরই এ ধরনের আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইনসেলের কাছে যায় তাদের মন্তব্যের জন্য। প্রতিটি ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডপ্রাপ্ত আসামির মামলার প্রেক্ষিত, তার ব্যক্তিজীবন ও আইনের বিষয় খুঁটিনাটি পরীক্ষা করা হয় এবং সর্বশেষ আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয় তার অনুমোদনের জন্য। সেখানেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে বহু সময়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু' বছর লেগে যায়। অথচ এ ক্ষেত্রে আবেদনের মাত্র ১০ দিনের মাথায় রাষ্ট্রপতি দন্ডাদেশ মওকুফ আদেশে সই করেছেন। এখানে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে আসে। আর তা হলো ১. এত দ্রুত এসব আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হলো কিভাবে অথবা হয়েছিল কি না এবং ২. কেবল আইন মন্ত্রণালয় নয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীও সংবিধানে দেয়া রাষ্ট্রপতির এই অধিকারকে দলীয় বিবেচনায় এভাবে ব্যবহার করার জন্য দায়ী। সুতরাং দায়িত্ব নিতে হলে সবাইকে নিতে হয়। এবং সম্ভবত সে কারণেই আইনমন্ত্রী এখনো তার ঘাড় বাঁচাতে পারছেন।

মহিউদ্দিন জিন্টুর ফাঁসির দন্ডাদেশ মওকুফ করা নিয়ে দেশের সংবিধান, আইন বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির পদের এ ধরনের ব্যবহার দেশে আইনের শাসন সম্পর্কেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। কিন্তু আইনমন্ত্রী বলছেন ভিন্ন কথা। র‍্যাবের ক্রসফায়ার কৌশলকে মানবাধিকার পরিপন্থী নয় বলে অহরহ বললেও এখন তিনি সামরিক আদালতের রায়ের বিষয়ে মানবাধিকারের কথা তুলেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, সামরিক আদালত কোনো আইনানুগ বিচারালয় নয়। এটা ক্যাঙ্গারু আদালত। তার রায়কে আইনের শাসন বলা যাবে না। সামরিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ না থাকায় সেটা মানবাধিকারেরও লঙ্ঘন। এই সূত্র ধরেই তিনি বলেছেন যে, সামরিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কেউ যদি আবেদন করতে চান তবে মন্ত্রণালয় এই মতই দেবে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান-উত্তরকালে সামরিক শাসনে দন্ডপ্রাপ্তদের সম্পর্কে এ ধরনের রিভিউ করার দাবি থাকলেও এবং বিএনপি সরকার সে ধরনের রিভিউ হাতে নিলেও তা বিশেষ কার্যকর থাকে, মওদুদ সাহেব সেই ব্যবস্থাকেই পাস করার সুযোগ করে দিয়েছেন। মওদুদ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের মাধ্যমে মওদুদ সাহেব পুরো আইন মন্ত্রণালয়কেই নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু নাইকোর আইন উপদেষ্টা সেজে কিংবা আইন মন্ত্রণালয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছাড় দেয়া সত্ত্বেও মওদুদ সাহেবের কিছুই হলো না। বরং তিনি আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের বলেছেন, পদত্যাগের ব্যাপারটা নিছকই গুজব। তিনি পদত্যাগ করছেন না। অর্থাৎ তিনি গদি আঁকড়েই থাকছেন!

প্লিজ ঝিন্টু প্লিজ...

মওদুদ সাহেব কিন্তু কম রেফারেন্স দেননি। তিনি বলেছেন, ক্ষমতা ত্যাগের এক ঘন্টা আগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডও একজন ফাঁসির আসামিকে ক্ষমা করেছিলেন। জানতে ইচ্ছে করে, সেও কি ঝিন্টুর মতো জোড়া খুনের আসামি ছিল অথবা ঐ মার্কিন খুনি কি সরাসরি জেরাল্ড ফোর্ডের দল করতো? মওদুদ সাহেব আরো বলেছেন, জোড়া খুনের আরেক আসামি আবুল কাসেম মানিককে এরশাদ নিজেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সুতরাং ক্ষমা তো করাই যায়। আইনবলে রাষ্ট্রপতি এটা করতে পারেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি কিংবা আইনমন্ত্রীরা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে কিছুই করেননি। তাছাড়া ক্ষমা তো মহৎ গুণ!?

সম্ভবত তখনই তিনি আরেক দণ্ডপ্রাপ্ত ঝিন্টুর বেদনাটা বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ এর আগে পুরনো ঢাকায় আয়োজিত যুবদলের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মওদুদ সাহেব। আর ঝিন্টু ছিলেন মহানগরী যুবদলের প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি

কিন্তু সব ক্ষমা কি গ্রহণযোগ্য? খুলনার কুখ্যাত খুনি এরশাদ শিকদারকে তাহলে ক্ষমা করা হয়নি কেন? অবশ্য নিন্দুকেরা বলছে অন্য কথা। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সবাই নাকি ঝিন্টুর কথা জানতেন। বিদেশে গেলে আতিথেয়তা, ভ্রমণ, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং ডলারে চাঁদা দিয়ে ঝিন্টু অনেকের প্রিয় হয়ে ওঠেন। তার ইচ্ছে আছে ঢাকা থেকে নির্বাচন করার। এবং সেই আসন হচ্ছে ঢাকার ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুরের আসন। বর্তমানে এ এলাকার এমপি অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ। তার সঙ্গে মওদুদ আহমদের দ্বন্দ্ব অনেক পুরনো। তার মন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল। পরে আইন মন্ত্রণালয় দেয়া হয় মওদুদ আহমদকে আর মাহবুব উদ্দিনকে বানানো হয় আইনবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি। জানুয়ারি মাসের এই ক্ষমা প্রসঙ্গটা জুলাই মাসে এসে আইনবিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে

হয়নি। এর বড় কারণ ছিল জিয়া ও এরশাদের উভয় সামরিক শাসনকে সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী দিয়ে বৈধতা দান। এই দুই ক্ষেত্রেই মওদুদ আহমদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। সংবিধান সংশোধন করে ঐ দুই সামরিক শাসনে গৃহীত আইন ও প্রশাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি বৈধতা দেয়ায় এখন তার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গোক্তি করা হবে নিজেদের মুখেই কালি লাগানো। সামরিক আদালতের রায়ের বৈধতার প্রশ্ন তুলে আইনমন্ত্রী এতদ্‌সংক্রান্ত সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে বিতর্ককেই বরং সামনে নিয়ে এলেন। এ বিষয়ে কথা হয় সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এনায়েতুর রহিমের সঙ্গে। তার নামে আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদের দায়েরকৃত মামলার প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন,

mB‡W‡b e¨wi÷vi gI`‡`i Wv‡b wS›U I ev‡q Gbvgj gwR` †PŠt

'মওদুদ সাহেব আমার নামে মামলা করেছে। ৩১/০৭/০৫ তারিখ মামলার দিন ধার্য ছিল। আমি আদালতে উপস্থিত ছিলাম। মাননীয় আদালত আগামী ৩১ আগস্ট দিন ধার্য করেছে। বিষয়টি আমি আইনগতভাবে লড়ব।'

এছাড়া, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ফাঁসি মওকুফ প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'বর্তমানে রাষ্ট্রপতির আইনগত রিভিউ করার বৈধতা নেই। সামরিক শাসনের সময় ছিল। সামরিক শাসন পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি এই রিভিউ করার ক্ষমতা তুলে নেয়। যে কারণে এখন রিভিউ করার কোনো সুযোগ নেই। ফলে আইনগত বৈধতা হারিয়েছে।

তারপরও মওদুদ অকুতোভয়। তিনি এখন রাষ্ট্রপতির ঘাড়ে বন্দুক রেখে ক্ষমতা প্রদর্শনে তার সাংবিধানিক ক্ষমতার কথা বলছেন। তিনি এও দাবি করছেন যে, অন্য রাষ্ট্রপতিরাও এ ধরনের ক্ষমা করে গেছেন। আর যে দ্রুততার কথা বলা হচ্ছে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার এক ঘন্টা আগে একজন ৭৫ বছর সাজা পাওয়া আসামির দন্ডাদেশ মওকুফ করেছিলেন। অবশ্য তিনি বলেননি যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঐ ক্ষমা প্রদর্শন আদেশের ক্ষেত্রে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল কি না। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ অতীত সরকারের ইতিহাসও টানছেন। কিন্তু একটি অন্যায় অন্য আরেকটি অন্যায়কে ঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত করে না।

সবার জানা যে, এরশাদ পতন আন্দোলনের শেষ মুহূর্তে এই মওদুদ আহমদ তিন জোটের রূপরেখার অসাংবিধানিকতা নিয়ে টেলিভিশনে যখন ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন, তখন ঐ পর্দায়ই এরশাদের পদত্যাগের খবর ভেসে ওঠে। মওদুদ তখন সরকার রক্ষা ছেড়ে নিজেকে রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখনও তিনি প্রতিদিন মিটিমিটি হেসে টেলিভিশনের পর্দায় আসছেন। কিন্তু ঝিন্টুর গলার ফাঁস এবার তার গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়াবে কি না। কৌতুহল মহলের উৎসুক দৃষ্টি এবার ঐ দিকে।

আজ সামরিক আদালতের রায়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন মওদুদ আহমদ। অথচ এদেশে সামরিক সরকারকে বৈধতা দেয়ার জন্য একাধিকবার সংশোধনী দেয়া হয়েছে। এবং মওদুদ নিজেও সামরিক সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। যদি তিনি সামরিক সরকারের রায়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন, তাহলে সামরিক সরকারকে বৈধতা প্রদানকারী সংশোধনী বাতিলের প্রশ্ন তুলছেন না কেন?

আবারও আলোচিত হয়। বেরিয়ে আসে থলের বিড়াল। অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন এমপি ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত দু'জনই বলেছেন, রাষ্ট্রপতির ক্ষমা করার এখতিয়ার থাকলেও সম্ভবত তার কাছে তথ্য গোপন করা হয়েছিল। যেকোনো বিচারেই ফাঁসির আসামির ক্ষমা পাওয়াটা অনৈতিক। যদিও মওদুদ আহমদ বলেছেন, সামরিক শাসনের সময় যেহেতু হাইকোর্টে আপিল করার সুযোগ থাকে না, এখন এ রকম কোনো ঘটনা ঘটলে তাকে হাইকোর্টে আপিল করার সুযোগই করে দেয়া উচিত এবং আমি হলে তাই দিতাম।

হায়, কার মুখে কী কথা! সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের মুখে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে, জেলে বসে এরশাদের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে কিংবা তারও আগে জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলে এই মওদুদ সাহেবই মন্ত্রী হতে এক হাজার মাইল বেগে দৌড় দিয়েছিলেন! বিচার ব্যবস্থা পৃথক করার কথা বলেও এই সরকারের মন্ত্রী হয়ে মাত্র ২৪ বার সময় নিয়েছেন। কিন্তু বিচার ব্যবস্থা যেখানে ছিল, সেখান থেকে এক বিন্দুও নড়েনি!

আসলে এ দেশে বিবেক বলে হয়তো আর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই। নৈতিকতা থাকতে নেই। সব নৈতিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে একজন খুনি, চাঁদাবাজের পক্ষে ক্ষমা এনে দেওয়া এখন আইনমন্ত্রীদের পক্ষেই সম্ভব।

মহিউদ্দিন ঝিন্টুর কাছে অনুরোধ, তিনি যেন একটা কথা রাখেন। তার ছেলে যখন তার কাছে জানতে চাইতো, বাবা দেশে যাও না কেন? তখন নাকি ঝিন্টু চুপ করে থাকতেন। তার ছেলেকে খুন কিংবা ফাঁসির ঘটনা তিনি বলতে পারেননি। মাঝে মাঝে আত্মহত্যার কথাও ভেবেছেন, কিন্তু ছেলের সামনে তার অতীত বলতে পারেননি!

ঝিন্টু সাহেব, অতীত ইতিহাসের মতো আপনার ক্ষমা পাওয়ার ঘটনাও দয়া করে আপনার ছেলেকে জানাবেন না। দোহাই আপনার! আমরা আমাদের সম্ভাবনাময় পরবর্তী বংশধরদের এ কথা জানাতে চাই না যে, এ দেশে মওদুদ নামে এক ডিগবাজি বিশারদ ছিলেন। তিনি মন্ত্রিত্বের লোভে সামরিক শাসকদের পদলেহন করেছিলেন! তিনি নিজ স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নাইকোর স্বার্থ দেখেছিলেন। তিনি নৈতিকতাকে কবর দিয়ে কুখ্যাত ফাঁসির আসামিকে ক্ষমা পাইয়ে দিয়েছিলেন...

জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু নাইকোর আইন উপদেষ্টা সেজে কিংবা আইন মন্ত্রণালয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছাড় দেয়া সত্ত্বেও মওদুদ সাহেবের কিছুই হলো না। তিনি পদত্যাগ করছেন না। অর্থাৎ তিনি গদি আঁকড়েই থাকছেন!